বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, ২০২২ (COP 27) নিয়ে প্রত্যাশা

ড. মোঃ সাইফুর রহমান

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ভয়ানক প্রভাব আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ আজ চরম বিপর্যয় ও হুমকির সম্মুখীন। ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (CRI) ২০২১, অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম, যদিও বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসারণে বাংলাদেশের অবদান নিতান্তই নগণ্য। জলবায়ুজনিত দুর্যোগ যেমন: তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, অসময়ে তীব্র বৃষ্টি, ঘন ঘন মৌসুমি ও আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অণুপ্রবেশ প্রভৃতির ক্ষতিকর প্রভাব জনজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত করছে।

জলবায়ুজনিত বিপর্যয় মোকাবেলায়, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালে প্যারিস শহরে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে সমবেত হয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন চুক্তিতে সম্মত হন, যা "প্যারিস চুক্তি" নামে পরিচিত। এটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থাৎ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বন্ধ করা ও জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন, এবং জলবায়ুর বিপর্যয় মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য দেশগুলিকে অর্থায়ন প্রদান ইত্যাদি চুক্তিবদ্ধ বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। বিগত বিভিন্ন সম্মেলনে ঘোষিত চুক্তি, সিদ্ধান্ত এবং প্রতিশ্রুতির সমর্থন ও বাস্তবায়নে, এ বছরও, জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 27) মিশরের শারম আল-শেখ শহরে, ৬ থেকে ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সম্মেলনে অতীতের প্রতিশ্রুতিগুলির অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য দেন-দরবারের মাধ্যমে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে মর্মে আশা করা যায়। আসন্ন COP 27-এর লক্ষ্য হলো:

"ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, অভিযোজন বাড়ানো এবং ন্যায়ভিত্তিক পর্যাপ্ত অর্থ জোগানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাজকে ত্বরান্বিত করা। অভীষ্ট লক্ষ্য হলো পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আরব প্রজাতন্ত্র মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি COP 27 সম্বন্ধে বলেন, COP-27 অস্তিত্বের হুমকির বিরুদ্ধে ঐক্য প্রদর্শনের একটি সুযোগ যা আমরা কেবল সমন্বিত পদক্ষেপ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিক্রম করতে পারি।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আমরা ধারণা করতে পারি, বিশ্ব যখন একটি সংঘাতমূলক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বড় সংকট অতিক্রম করছে চলমান জলবায়ু সম্মেলন একটি বড় সাফল্য হতে পারে। কাজেই, চলমান দশকে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা, সমন্বিত পদক্ষেপ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আশা করতে পারি। জলবায়ু সম্মেলন সম্বন্ধে এই আলোচনাটি বাংলাদেশসহ, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ , বিশ্ব জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থনকে জোরালো করবে। ।

জলবায়ু প্রশমন বিষয়ে জরুরি হলো, শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বন্ধ করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নির্ধারণ করা এবং অতি দ্রুত তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, অর্থাৎ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান/প্রতিশ্রুতি যা সংক্ষেপে NDC নামে পরিচিত, এর পুনর্বিবেচনা এবং শক্তিশালীকরণ, কয়লা শক্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা এবং অকার্যকর জীবাশ্ম জ্বালানীর ওপর ভর্তুকি দূর করা, মিথেনসহ অ-কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, এবং বন রক্ষায় ও ভূমি ক্ষয়রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ।

আসন্ন জলবায়ু সম্মেলনে অভিযোজন সম্পর্কে প্রত্যাশা হলো, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অভিযোজন সক্ষমতা জোরদার করা ও সহনশীলতা বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো ইত্যাদি বিষয়ে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের মতো বিপদাপন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত, ইকোসিস্টেম ভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক অভিযোজন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে আশা করা যায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলির তাদের নিজ নিজ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং NDC-তে চিহ্নিত অগ্রাধিকারভুক্ত অভিযোজন কার্যক্রমের কার্যকর ও আশু বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা এবং সক্ষমতা প্রয়োজন যা অবিলম্বে প্রদানের জন্য উন্নত বিশ্বের নিকট জোর দাবি জানাবে।

অতি সম্প্রতি, বাংলাদেশ National Adaptation Plan (NAP) বা জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনায় চিহ্নিত ১১ টি জলবায়ু সংকটপূর্ণ এলাকায় ৮ টি খাতের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনে সর্বমোট ১১৩ টি মধ্যমেয়াদি (২০৪১) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০৫০) অভিযোজনের পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাল ধরা হয়েছে ২৭ বছর (২০২৩-২০৫০) যা বাস্তবায়নকালে মোট ২০,০৩৭ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ প্রায় ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান অর্থের প্রয়োজন হবে। একটি উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রণীত আলোচ্য অভিযোজন পরিকল্পনা সরকারের মধ্যম

থেকে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন সম্পর্কিত নীতি উপকরণ যেমন: আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, তথ্য ও জ্ঞান, বিধি ও ব্যবস্থাপনা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র ও চাহিদা নিরূপণ করেছে; যা অবশ্যই প্যারিস চুক্তির নীতির উপর ভিত্তি করে অধিক কার্বন নিঃসারণকারী উন্নত অর্থনীতির দেশগুলি থেকে উপযুক্ত অর্থায়ন/প্রযুক্তি সংস্থানের জন্য উপযুক্ত নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া, অনুমান করা যায়, উন্নত দেশগুলি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং-সহ অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রদানের জন্য একটি অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে কাজ করবে। অধিকন্তু, স্বল্পোন্নত দেশ এবং ছোট দ্বীপের পক্ষগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি (লস অ্যান্ড ড্যামেজ) সম্পর্কিত ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে পূর্বের আলোচনার (যেমন: সান্টিয়াগো নেটওয়ার্ক, গ্লাসগো) পূর্ণ বাস্তবায়নের জোর দাবি করবে।

বিপদাপন্ন উন্নয়নশীল/স্বল্পোন্নত দেশগুলি অনুমানযোগ্য, অধিগম্য এবং প্রয়োজন-ভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন, জ্ঞান হস্তান্তর, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সক্ষমতা বাড়াতে শিল্পোন্নত দেশ থেকে ন্যায়ভিত্তিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে জোর দাবি জানাবে, যা প্যারিস চুক্তির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং বাংলাদেশের মতো দেশের জলবায়ু ঝুঁকি কমানোর জন্য খুবই জরুরি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র গ্লাসগো, যুক্তরাজ্য (COP 26) সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ:

“সীমিত দায় এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথাপি, জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমনে উন্নত দেশগুলোকেও তাদের প্রতিশ্রুত বাৎসরিক শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন সমভাবে (৫০:৫০) নিশ্চিত করতে হবে”।

কাজেই, উন্নত দেশগুলির উচিত হবে প্রতি বছর প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার একটি সুনির্দিষ্ট বিতরণ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রদানপূর্বক স্বল্পোন্নত বিপদাপন্ন দেশগুলির আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

স্বল্পোন্নত/উন্নয়নশীল দেশগুলি জিসিএফ, জিইএফ, এবং অভিযোজন তহবিল বোর্ডসহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উৎস থেকে অতিরিক্ত অর্থায়নের দাবি করবে সংশ্লিষ্ট জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য, যা হবে সম্পূর্ণ অনুদানের ভিত্তিতে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশেষ করে অভিযোজনে বাংলাদেশ স্থানীয়ভাবে যে দায়িত্ব পালন করে চলেছে তা অগ্রগণ্য ও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮ক অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে, নীতি ও পরিকল্পনা যেমন: জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা নাপা, ২০০৫; বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন নীতি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি),২০০৯; বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০; মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (এমসিপিপি) দশক, ২০৩০; জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০২১ -২০২৫; হালনাগাদকৃত জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ ইত্যাদি দেশের জলবায়ু অভিযোজন প্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধি করে জলবায়ু সহিষ্ণুতা অর্জনে অবদান রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে এ পর্যন্ত ৮ শত টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪ শত ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশ এখন তার বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৬-৭ শতাংশ জলবায়ু অভিযোজনের জন্য ব্যয় করছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অগ্রগণ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গ্লোবাল সেন্টার অন এডাপটেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যাবস্থাপনা, জলবায়ু উদ্বাস্তু জনগণের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন, জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো, উন্নত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও নগরের সহিষ্ণুতা, বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনীর উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট তৎপর; এখন আমরা বিশেষত উন্নত বিশ্বের নিকট থেকে অধিক কার্বন নিঃসারণের জন্য ন্যায্যসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা করি– যা ইতোমধ্যে অনেক প্রলম্বিত হয়েছে। জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় আমরা ইতোমধ্যে কতটুকু অর্জন করেছি এবং আরও কার কী করা দরকার তার পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বড় দূষণকারী কোম্পানি এবং বেসরকারি খাতগুলির জলবায়ু কার্যকলাপে যথেষ্ট সম্পৃক্ততা এবং অর্থবহ অর্থায়নের পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে আসন্ন সংলাপে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সকল পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। আমরা অংশগ্রহণকারী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে দেখতে চাই, সামঞ্জস্য নীতি, ক্ষমতার ভারসাম্য, আলোচনার একতান, অর্থপূর্ণ সহবস্থান, সম্মিলিত পরিকল্পনা–সম্মিলিত সৃষ্টি, অভিপ্রায় বা ধারণার সংমিশ্রণ এবং সবিশেষ প্রতিশ্রুতি থেকে কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অভীষ্ট উপকারভোগীর কাছে জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজনে উপযুক্ত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থ

সময়মত পৌঁছে দেওয়া। আমাদের সময় অত্যন্ত সীমিত; আর নয় কোন শূন্য যোগ সমীকরণ, এখন দরকার পরিকল্পনা ও নীতির বাস্তবায়ন। আমরা চাই এই পৃথিবী নামক গ্রহ ও মানবতার কল্যাণ, একই সাথে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

পরিশেষে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর অতি প্রাসঙ্গিক ভাবনা আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ ও অগ্রযাত্রার পাথেয়:"আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভর হওয়া, জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসই হবে আমাদের অগ্রযাত্রার দিশারী। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সহজতর করবে এবং সন্দেহাতীতভাবে তা জনদুর্ভোগ কমাতে সহায়ক হবে"।

#

লেখক: উপসচিব (পরিকল্পনা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; Alexander von Humboldt (AvH), Germany Post-Doctoral Fellow

পিআইডি ফিচার